MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
অনলাইন বুলেটি-৩
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র । জুন ২০২০

কার্ল মার্কস

[আমেরিকান সাংবাদিক জন সুইন্টন লন্ডনে গিয়েছিলেন মার্কসের সাক্ষাৎকার নিতে। মার্কস তখন অসুস্থ। সুস্থ হবার প্রত্যাশায় বন্ধুরা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন সমুদ্র সৈকতে। সেখানেই সুইন্টন তার সাক্ষাৎকার নেন। সুইন্টনের সাক্ষাৎকারে এমন কোন বিষয় নেই যা তিনি জানতে চাননি মার্কসের কাছ থেকে। মার্কসের সাথে থেকে তার যে অনুভূতি তার প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছিলেন এই ছোট লেখাটিতে। যা প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে। গত ৫ মে ছিলো মার্কসের ২০২তম জন্মবার্ষিকী। সে উপলক্ষে লেখাটি আমরা প্রকাশ করলাম। এই ছোট্ট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ লেখাটি মার্কসের জীবন দর্শন বুঝতে সহায়তা করবে বলে আমাদের ধারণা।]

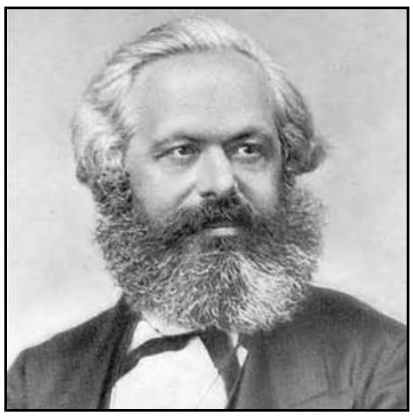

একালের অতি বিশিষ্ট মানুষদের অন্যতম, যিনি বিগত ৪০ বছরের বিপ্লবী রাজনীতিতে অজানা হলেও অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছেন, সেই মানুষটি হলেন কার্ল মার্কস। ইনি হলেন এমন একজন মানুষ যাঁর নিজেকে জাহির করা বা নামের কোন মোহ নেই। জীবন আড়ম্বরের দিকে কিংবা ক্ষমতা ব্যবহারের দিকে যাঁর কোন আগ্রহ নেই, একজন মানুষ যিনি তাড়াহুড়ো করেন না আবার বিশ্রামের কোন অবকাশ নেই যাঁর, এই একজন মানুষ প্রসস্ত, শক্তিমান ও সমুন্নত মনের অধিকারী, যাঁর চিন্তায় রয়েছে নানা দূরপ্রসারী সম্ভবনাময় পরিকল্পনা, যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতি ও বাস্তববাদী লক্ষ্যমাত্রা, যে সব আলোড়নে নানা জাতির জীবন আলোড়িত হয়েছে, অনেক সিংহাসনের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে যিনি সেই সব আলোড়ন ও ভূকম্পনের পিছনে ছিলেন এবং আজও রয়েছেন, যাঁর সক্রিয়তা এখনো বহু মুকুটধারী ও প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন প্রতারকদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁর সঙ্গে তুলনা করার মতো মানুষ ইউরোপে আর নেই। এমন কী জোসেফ মাৎসিনিকেও তাঁর সঙ্গে ঠিক তুলনা করা যায় না। বার্লিনের ছাত্র, হেগেলীয়তত্ত্বের সমালোচক, নানা পত্রিকার সম্পাদক এবং নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনের সংবাদদাতা হিসেবে তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যের ও মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন, তিনিই হলেন একদা ত্রাস সৃষ্টিকারী ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা ও পথ নির্দেশক, এবং 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের লেখক।

ইউরোপের প্রায় অর্ধেক দেশ থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন, প্রায় সব দেশে তাঁর রচনা নিষিদ্ধ হয়েছে এবং তিনি বিগত ৩০ বছর ধরে লন্ডনে আশ্রয় পেয়ে বসবাস করছেন। আমি যখন লন্ডনে আসি তখন তিনি লন্ডনবাসীদের প্রিয় সমুদ্রতীরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র র‍্যাম্‌সগেটে ছিলেন। সেখানেই আমি দেখলাম তাঁর কটেজে, মার্কস পরিবারের দুই প্রজন্মকে। সেখানে কটেজের দ্বার প্রান্তে সুমিষ্টিভাষিণী, সাধুসন্তের মতো মুখশ্রী, কোমল শোভন চেহারার যে নারী আমায় স্বাগত জানালেন, বুঝতে অসুবিধা হলো না যে তিনি গৃহকর্ত্রী, কার্ল মার্কসের সহধর্মিনী। আর বিরাট মাথার এক রাশ আবাধ্য পাকা ঝাঁকড়া চুল ওয়ালা, সৌম্য দর্শন, দয়ালু চেহারায় ৬০ বছরের মানুষটি, তিনিই কি কার্ল মার্কস? তাঁর কথা এতো স্বচ্ছন্দ, এতো সর্বব্যাপক, সৃজনশীল, অন্তর্ভেদী, অথচ এতো অকৃত্রিম–যার সঙ্গে মিশে আছে ব্যঙ্গ, রসিকতার ছোঁয়া, দিলখোলা আনন্দের ধারা, যা আমায় সক্রেটিসের কথা মনে করিয়ে দিল। ইউরোপের নানা দেশে রাজনৈতিক শক্তি আর জনপ্রিয় আন্দোলনের কথা বলছিলেন তিনি–রাশিয়ার আত্মার বিরাট স্রোতধারা, জার্মান মননের গতিশীলতা, ফ্রান্সের কর্মচঞ্চল আর ইংল্যান্ডের নিথরতার কথা। তাঁর কথায় প্রকাশ পেল রাশিয়া সম্পর্কে আশার কথা, জার্মানী সম্পর্কে এক দার্শনিক মনোভাব, ফ্রান্স সম্পর্কে খুশির মনোভাব, আর ইংল্যান্ড প্রসঙ্গে বিষণ্ন গাম্ভীর্য। ঘৃণার সঙ্গে উল্লেখ করলেন সেই সব নিতান্ত 'ক্ষুদ্র সংস্কারের' কথা যা নিয়ে পার্লামেন্ট, উদারনৈতিকরা সময় কাটিয়ে দেন। একটি একটি করে ইউরোপের দেশগুলোর সমীক্ষা করে, তাদের বিকাশধারার বৈশিষ্ট্যগুলি, প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে যে সব শক্তি ও ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তাদের উল্লেখ করে তিনি দেখালেন যে, ঘটনার গতি সেই দিকেই চলেছে যেখানে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবেই। তিনি যখন কথা বলছিলেন তখন মাঝে মধ্যেই আমি বিস্ময় বোধ করছিলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, এই মানুষটি, যাঁকে এতো কম দেখা গেছে যাঁর সম্পর্কে এতো কম জানা গেছে, তিনি কিন্তু সময়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন; আর নেভা (রাশিয়ার নাদী) থেকে সিন (প্যারিসের নদী), উরাল (পর্বতমালা) থেকে পীরেনীজ্ (পর্বতমালা) পর্যন্ত তাঁর হাত কাজ করে চলেছে নতুনের আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত করতে। অতীতে যেমন বহু কাম্য জিনিস ঘটে গেছে, মানুষ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছে, যার সমুচ্চ শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফরাসি বিপ্লব, সেগুলি যদি ব্যর্থ হয়ে না

গিয়ে থাকে তাহলে তাঁর কাজও ব্যর্থ হয়নি। তিনি যখন কথা বলছিলেন, তারই মধ্যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি এখন কিছু করছেন না কেন?' যেটা ছিল এই ভাবধারায় অজ্ঞ একজন মানুষের প্রশ্ন, যাতে তিন সরাসরি কোন জবাব দিতে পারলেন না।
তাঁর কাছে যখন জানতে চাই তাঁর মহাগ্রন্থ 'ক্যাপিটাল',বিরাট সম্ভবনার উৎস যেটি, কোন কিছু বলার নেই তাতে।
কেবল এইটুকু বললেন নিউইয়র্ক থেকে একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব তাঁর কাছে এসেছে। তিনি বলেন প্রকাশিত খণ্ডটি তিন খণ্ডে বিভক্ত মূল গ্রন্থের একটি অংশ মাত্র , অপর দুটি খণ্ড এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটির তিনটি অংশ হলো 'ল্যান্ড', 'ক্যাপিটাল', ও 'ক্রেডিট' । এই শেষ খণ্ড 'ক্রেডিট' রচনার বেশির ভাগ উদাহরণ তিনি দিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, কারণ সেখানেই ক্রেডিটের বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে। মি. মার্কস হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘটনাবলির পর্যবেক্ষক। মার্কিন জীবনধারার কিছু কিছু গঠনকারী ও মৌল শক্তি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য গভীর ব্যঞ্জনাময়। কথা প্রসঙ্গে ক্যাপিটালের কথা উঠলে তিনি বলেন, যদি কেউ বইটি পড়তে চান তাহলে মূল জার্মান সংস্করণের চেয়ে ফরাসি অনুবাদ সংস্করণ পড়া নানা দিক থেকে সুবিধার হবে। কারণ এটি সত্যই ভালো। কথা প্রসঙ্গে মার্কস বলেন, ফরাসি অঁরি রশেফোর্ট, তাঁর কিছু প্রয়াত অনুগামী, উদ্দাম প্রকৃতির বাকুনিন, প্রতিভাবান লাসাল এবং আরও অনেকের কথা। আমি ভাবতে লাগলাম এই সব মানুষগুলি, যাঁরা বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কেউ ইতিহাসের নিয়ামক হতে পারতেন, মার্কসের প্রতিভা কতো গভীরভাবে তাঁদের প্রভাবিত করেছিল।
সেদিনের অপরাহ্ন বেলা ইংল্যান্ডের এক গ্রীষ্ম সন্ধ্যার দীর্ঘ বিলম্বিত গোধূলির মধ্যে বিলীন হয়ে গেল মি. মার্কসের আলোচনা শুনতে শুনতে। সমুদ্রতীরের সেই শহরে কিছুটা ঘুরে বেড়ানোর প্রস্তাব করলেন তিনি। উপকূল ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে পড়লাম বালুবেলায়। দেখলাম হাজার হাজার মানুষ, যার বেশির ভাগটাই ছেলেমেয়ের দল খেলাধুলায় আনন্দে মেতে আছে। সেই বেলাভূমিতেই দেখা হলো মার্কস পরিবারের বাকি সকলের সঙ্গে...তাঁর স্ত্রী, যিনি ইতিপূর্বেই আমায় স্বাগত জানিয়েছেন, ছেলে মেয়েসহ তাঁর দুই কন্যা, দুই জামাতা, যাদের একজন কিংস কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক, আরেকজন আমার বিশ্বাস সাহিত্যিক কেউ হবেন। সেটা ছিল খুবই আনন্দময় একটা দল...মোট জন দশেক হবে–ছেলে মেয়েদের নিয়ে সুখী দুই তরুণী স্ত্রীর পিতা, আর সেই বাচ্চাদের দিদা, যিনি এই মানুষটির স্ত্রী হিসেবে সৌম্য-শান্ত এক আনন্দের প্রতিচ্ছবি হয়ে ছিলেন। দাদা মশায় কেমন করে হতে হয় সেই কৌশল ভিক্টর হুগোর চেয়ে কার্ল মার্কস মোটেই কিছু কম জানতেন না। হুগোর চেয়ে তাঁর ভাগ্যও বেশি প্রসন্ন ছিল, কারণ মার্কসের বিবাহিতা কন্যারা সবাই বেঁচেবর্তে থেকে তাঁর বৃদ্ধ বয়সের দিনগুলি আনন্দমুখর করে রেখেছিল। রাত্রি হয়ে আসলে তিনি ও তাঁর দুই জামাতা নিজেদের পরিবার থেকে কিছুটা সময় সরিয়ে এনে তাঁদের মার্কিন অতিথির সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটিয়ে গেলেন। সেই আলাপচারীতে সমুদ্রের শব্দের সঙ্গে আমাদের গেলাসের টুং টাং শব্দের মেলানো সুরের মধ্যে সারা দুনিয়া, নানা মানুষ, সমকাল, ভাবধারা, কতো প্রসঙ্গ এসে গেল। কিন্তু রেলগাড়ি তো কারো জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না। রাত্রিও বাড়ার মুখে। সারাদিনের কতো কথা, বকবকানি, বয়সের ও সময়ের ভার, দিনের আলোচনা, সন্ধ্যার দৃশ্যাবলি সব কিছু ছাপিয়ে আমার মনে তখন একটি প্রশ্ন ক্রমেই মাথা উচিঁয়ে দাঁড়িয়েছিল। অস্তিত্বের চূড়ান্ত নিয়ম কী? যে উত্তর জানার জন্য মানবজাতি যুগের পর যুগ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেই প্রশ্ন যেন আমাদের সত্ত্বাকে, তার নিয়ামক বিধিকে স্পর্শ করে যাচ্ছিল। এই ঋষিকল্প মানুষটির কাছে আমি তার উত্তর জানতে চাইলাম। ভাষার গভীরতার মধ্যে ডুব দিয়ে, গুরুত্বের শিখরে দাঁড়িয়ে, আলাপচারীর এক নৈঃশব্দ্য, বিরতির মধ্যে, সেই বিপ্লবী ও দার্শনিক কথার মধ্যেই আমি মর্মস্পর্শী শব্দে জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তর কী হবে?
সামনে গর্জনশীল সমুদ্র আর বেলাভূমির চঞ্চল মানুষদের দিকে চেয়ে মনে হলো মুহূর্তের জন্য তাঁর মন অন্তর্মুখীন হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর উত্তর কী হবে? যার উত্তরে গভীর, ভরাট, গম্ভীর গলায় তিনি বল্লেন 'সংগ্রাম'! প্রথমে মনে হলো যেন কোন হতাশার প্রতিধ্বনি শুনছি। কিন্তু না। সেটাই হলো জীবনের নিয়ম।